

ওয়াজ ডারউইন রং?

রায়হান আবীর

২০০১ এর ফেক্রয়ারিতে গ্যালাপ পোল (gall up pol) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক হাজার তরনের টেলিফোন সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। সাক্ষাৎকারে শতকরা ৪৫ ভাগের বেশি তরন মানুষের উৎপত্তি বিষয়ক বাইবেলীয় ধ্যান ধারনাকেই সত্য বলে মত প্রকাশ করেন যে, একজন ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছিলেন আজ থেকে ছয় হাজার বছর আগে। এই ছয় হাজার বছরে মানুষ হয়তো পরিবর্তিত হয়েছে, তবে সেটা খুব সামান্য এবং পরিবর্তনের কারণ কখনই “বিবর্তন” নয়। শতকরা ৩৭ ভাগ বিবর্তন এবং বাইবেলকে একই কক্ষে স্থান দিয়েছেন। তাঁদের মতে, বিবর্তন জন্মসৃষ্টির একটি স্বর্ণীয় প্রক্রিয়া। আর শতকরা ১২ ভাগের মতে, তৃতীয় কারও কোনও রকম সহায়তা ছাড়াই বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে।

এই ভোটাভুটি থেকে দেখা যায়, শতকরা প্রায় ৫০ ভাগের মতো মার্কিনী বিবর্তন তত্ত্বকে একেবারে বাতিল করে দিয়েছেন। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, প্রায় দুই দশক ধরে এই সংখ্যাটা একদম কমেনি। জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে, ১৯৮২, ১৯৯৭ এবং ১৯৯৯ সালে। সৃষ্টিতত্ত্বঃ “বিবর্তন নয়, ঈশ্বরই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন” এই মতে বিশ্বাসীর সংখ্যা ৪৪ ভাগের নিচে কখনই নামেনি।

গত দেড়শ বছরে বার বার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে বিবর্তন তত্ত্বকে। পক্ষে বিপক্ষে বিবর্তকের বাঢ় উঠেছে। আর কোনও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে এতোটা ধকল সহ্য করতে হয়নি, যতটা করতে হয়েছে বিবর্তন তত্ত্ব কে। তবে মজার ব্যাপার হলো, এই ধরণের সকল বির্তকই হয়েছে কখনও ওয়েবসাইটে, কখনও ব্লগে কিংবা ফোরামে আর কখনও বা ব্যক্তি বিশেষে। কোনও বৈজ্ঞানিক জার্নালে “বিবর্তন হয়েছে, কি হয় নি” এই নিয়ে বিজ্ঞানীদের মাঝে তর্ক হয় না (তাঁরা সকলেই তথ্য প্রমান ঘেটে একমত যে বিবর্তন হয়েছে), তর্ক হয় বিবর্তন কীভাবে ঘটছে তার পদ্ধতি নিয়ে (যেমন ধীর গতিতে ঘটছে নাকি উল্লম্ফন ঘটছে)। কিংবা বিবর্তনের পদ্ধতি কি ফাইলেটিক, স্যালটেশন নাকি কোয়ান্টাম এ ব্যাপারে।

সাধারণের মাঝে তাহলে এতো তর্ক বিতর্কের কারণ কী? কারণ অবশ্যই অজ্ঞানতা। তাদের কাছে বিবর্তন তত্ত্ব মানেই “আমরা বাঁদর থেকে এসেছি” টাইপ সরলীকরণ কথা। বেশিরভাগেরই বিবর্তন জ্ঞান আহোরিত হয়েছে সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী মানুষজনের বিবর্তন বিরোধী প্রোপাগান্ডা মূলক বক্তৃতা থেকে। অথচ বিজ্ঞান জানতে হলে বিজ্ঞানের বই পড়ার বিকল্প নেই। যদিও বেশিরভাগই সেই পথে না যেয়ে সরাসরি বিবর্তনকে “অপবিজ্ঞান” আখ্যা দিয়ে থাকেন। এই প্রবন্ধে আমরা একেবারে বিবর্তনের সাধারণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো। উদ্দেশ্য একটাই- জনসচেতনতা বাড়ানো। বিবর্তন তত্ত্বকে বাতিলের খাতায় ফেলে দেবার আগে একটু চিন্তার খোরাক জোগানো।

চার্লস ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের সারকথা- “প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন”। জীবিত সকল প্রাণীকূলের এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে পরিবর্তন, বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যেকার বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই তত্ত্বের মাধ্যমে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তখনই কোনও কিছুকে বলা হয় যখন তার ব্যাখ্যা যথার্থ পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণের মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে সমর্থিত এবং বাস্তব সত্য বলে প্রমাণিত হয়। এটি সকলে জানলেও বিবর্তনের পাশে লাগানো “তত্ত্ব” শব্দটিকে তাঁরা ভিন্নার্থে ব্যবহার করে থাকেন। বিবর্তনকে তাঁরা বলে থাকেন, “স্রেফ” একটা তত্ত্ব, আর কিছু না।

বিবর্তন স্রেফ একটা তত্ত্ব হলে, আইনস্টাইনের “আপেক্ষিকতার তত্ত্ব” ও স্রেফ একটা তত্ত্ব। “সূর্য পৃথিবীকে নয় বরঞ্চ পৃথিবী সূর্যকে আবর্তন করছে” - ১৫৪৩ সালে দেওয়া কোপারনিকাসের এটাও স্রেফ একটা তত্ত্বই। কটিনেটাল ড্রিফট ও শুধুই একটি তত্ত্ব। এই ধরনের সকল তত্ত্বের ব্যাখ্যাই যথার্থ পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণের মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে সমর্থিত এবং বাস্তব সত্য বলে প্রমাণিত।

বিবর্তন বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তত্ত্ব। মানবকল্যাণ, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রাণীজগত সম্পর্কে যথাযথ ধারনা পাবার জন্য বিবর্তন তত্ত্বের বিকল্প নেই। তবে তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ ধারনাগুলো কিছুটা জটিল। তবে এতোটা জটিল নয় যে, মনোযোগী পাঠক তা বুবাতে পারবেন না। সাথে রয়েছে পাহাড় সমান প্রমাণ, বিভিন্ন দিক থেকে। যা প্রতিনিয়ত বাঢ়ছে, সংরক্ষিত হচ্ছে বিভিন্ন জাদুঘরে, টেক্সট হিসেবে আসছে জনপ্রিয় বিভিন্ন বইয়ে, পাঠ্যবইয়ে, অজস্র পিআর- রিভিউ বৈজ্ঞানিক পেপারে। সুতরাং বিবর্তনকে “বিশ্বাসের” কোনও বস্তু বানানোর দরকার নেই। অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যেমন, বিবর্তনও তাই।

বিগল যাত্রা থেকে ফিরে আসার প্রায় বাইশ বছর পর, ১৮৫৯ সালে “দ্য অরিজিন অফ স্পিশিজ” বইটি প্রকাশ করেন ডারউইন। দ্যাট বুক রকড দ্য ওয়ার্ল্ড লাইক এ হারিকেন। ৪৯০ পৃষ্ঠার এই বইটিতে ডারউইন মোটা দাগে তিনটি প্রধান দাবির কথা বলেন।

১। জীবনের সৃষ্টি নিকট অতীতে নয়, বরঞ্চ তা এর থেকে অনেক অনেক আগে। (কয়েকশ কোটি বছর)।

২। জীবনের সূচনা হয়েছিলে সরল এককোষী এক বা একাধিক জীব থেকে। সেখান থেকেই বিবর্তনের পথ ধরে আজকের লক্ষ- কোটি প্রজাতির জীবের উৎপত্তি হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীতে দেখা জীবজগতের মধ্যে উৎপত্তিগতভাবে, বংশধারার উত্তরাধিকারসূত্রে পারস্পরিক একটা সম্পর্ক রয়েছে।

৩। সরল এককোষী জীব থেকে পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রজাতিতে বিবর্তনের কারণ হিসেবে ডারউইন প্রাকৃতিক এক অঙ্ক শক্তিকে দায়ি করেন। যার নাম তিনি দেন, “ন্যাচারাল সিলেকশন” বা “প্রাকৃতিক নির্বাচন”।

আজ থেকে দেড়শ বছর আগে যখন ডারউইন এই তিনটি ধারনার কথা বলেন, তখন তাকে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে হয়েছিল কল্পনা শক্তির উপর। কারণ অপ্রতুল প্রমাণ। কিন্তু আজ আমাদের হাতে এই ধারনা প্রমাণের যথেষ্ট হাতিয়ার রয়েছে। আমরা এক এক করে দেখবো- ডারউইন সঠিক ছিলেন কি না।

জীবনের বয়স কতদিন?

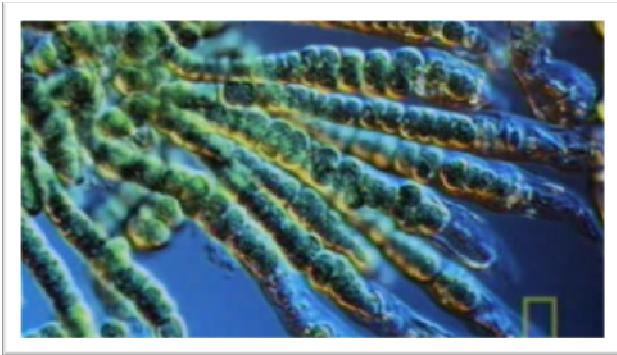
বাইবেলীয় বর্ণনায় বলা হয়, খুব নিকট অতীতেই জীবন সৃষ্টি করা হয়েছিল। সকল জীবিত প্রাণীকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন মাত্র হয় হাজার বছর আগে। ডারউইন প্রথমেই এই ধারনাকে বিরাট ধাক্কা দেন। তিনি বলেন, না!! জীবনের সূচনা হয়েছে আরও অনেক বছর আগে।

কে সঠিক তাহলে? জীবনের সূচনা আসলেই কবে থেকে?

ভূ- তত্ত্ববিদ ডষ্টের মার্টিন ভ্যান ক্রেনেনডন্স দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় আবিষ্কার করেন পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন ফসিল।



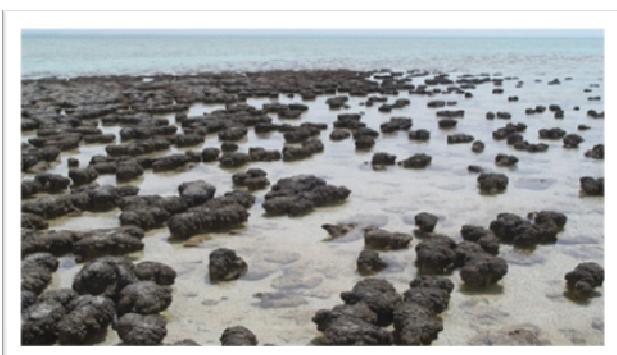
আবিষ্কৃত ফসিলাইজড স্ট্রোমেটোলাইটস এর ছবি। সমুদ্রের তলদেশে থাকা ব্যাকটেরিয়ার কলোনী দ্বারা এমন একটি স্ট্রোকচার গঠিত হয়েছে।



সরল এককোষী জীব

বিজ্ঞানীদের মতে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে ব্যাকটেরিয়াসদৃশ সরল এককোষী জীব থেকে। প্রথম দুটি ছবি মেলালে বেশ বোঝা যায় প্রাণ ফসিলাইজড স্ট্রোমেটোলাইটস ই আমাদের দাদার দাদার দাদার দাদা।

কিন্তু পাথরের ওপর এমন দাগ কাটা দেখে অনেকের মনেই সন্দেহ জাগতে পারে, আসলেই কি এগুলো সমুদ্রের তলদেশে থাকা ব্যাকটেরিয়া কলোনী দ্বারা গঠিত? এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়, মাত্র ৬০০ মাইল দূরে শার্ক' তে। সেখানে বিজ্ঞানীরা ফসিল হয়ে যাওয়া স্ট্রোমেটোলাইটসদের সাথে সরাসরি সাদৃশ্যপূর্ণ জীবিত স্ট্রোমেটোলাইটস এর সঙ্গান পেয়েছেন।



শার্ক' বে তে আধ্যাতিক স্ট্রোমেটোলাইটস

প্রমাণ হলো এগুলো ব্যাকটেরিয়া। কিন্তু আমাদের জানা দরকার পৃথিবীর সবচেয়ে আদিমতম এই ফসিলটি কত বছরের পুরানো? এটা কী সৃষ্টি তত্ত্বে বিশ্বাসীদের মতে কয়েক হাজার বছর আগের, নাকি ডারউইনের বলে যাওয়া কয়েকশ' কোটি বছর?

ফসিলের বয়স নির্ধারণের জন্য বিজ্ঞানীরা যেই পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন তার নাম “রেডিওমেট্রি”। পাথরের মধ্যে অবস্থিত কয়েকটি মৌলিক উপাদানের সময়ের সাথে তেজস্ক্রিয়তা বিকিরণ পরিমাপের মাধ্যমে পাথরটির বয়স নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

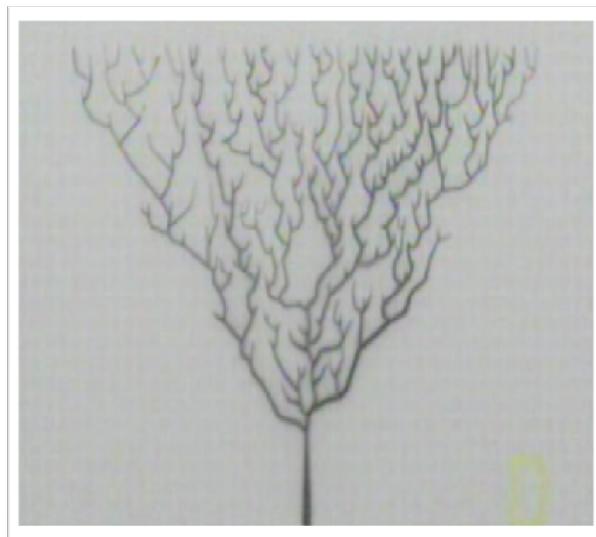
“রেডিওমেট্রি” র মাধ্যমে প্রাণ ফসিলাইজড স্ট্রোমেটোলাইটস পরীক্ষা করে দেখা যায় এদের বয়স প্রায় ৩.৫৬ বিলিয়ন বছর। প্রায় সাড়ে তিনশ' কোটি বছর।

শুধু এই একটি ফসিল নয়, প্রাণের উৎপত্তি যে, কয়েকশ' কোটি বছর আগে সেটির প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তীতে আবিষ্কৃত আরও অনেক ফসিলের বয়স হিসেব করে।

সুতরাং ডারউইনের প্রথম দাবিটি একদম সঠিক। প্রাণের বয়স আসলেই কয়েক হাজার বছরের থেকে অনেক- অনেক পুরানো।

দ্বিতীয় দাবি

বিবর্তন তত্ত্বতে জীবনের সূচনা হয়েছিল একটি অথবা সামান্য কয়েকটি সরল এককোষী জীব থেকে। লক্ষ কোটি বছরে এই ধরনের সরল এককোষী জীবরা বিবর্তিত হয়ে পরিণত হয়েছে ভিন্ন একটি জীবে। এভাবে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রজাতি থেকে প্রজাতিতে জীবন বিবর্তিত হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে প্রজাতির সংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে বৈসাদৃশ্য এবং প্রাণীদের গঠন হয়েছে জটিল থেকে জটিলতর।



ট্রি অফ লাইফ

অপরদিকে সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসীরা বলে থাকেন, জীবন পরিবর্তিত হয়নি। আমরা বর্তমানে যেভাবে দেখি অস্টা সকল প্রাণীকে ঠিক এভাবেই সৃষ্টি করেছিলেন। সহস্র বছর ধরে তারা অপরিবর্তিত রয়েছে।

কে সঠিক তাহলে?

সেটা প্রমাণ করার সবচেয়ে সুবিধাজনক উপায় হচ্ছে ফসিল রেকর্ডগুলোকে পরীক্ষা করা। বিশ্বের বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে লক্ষাধিক ফসিল। “রেডিওমেট্রি” র সাহায্যে প্রতিটা ফসিলই ঠিক কর বছর আগের তা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা হয়েছে।

এখন ডারউইন যদি সঠিক হয়ে থাকেন তাহলে আমরা আশা করবো, সবচেয়ে পুরাতন ফসিলগুলো হবে সরল এককোষী। এবং যত সামনের দিকে এগোতে থাকবো ফসিলগুলোর মধ্যে তত বৈচিত্র্য থাকবে, থাকবে জটিলতা।



৯১ তলা বিশিষ্ট এস্পেয়ার স্টেট বিল্ডিং

পৃথিবীতে কোনও নির্দিষ্ট সময়ে কোনও ধরনের জীবন ছিল সেটা ব্যাখ্যা করার জন্য পৃথিবীর ইতিহাসটাকে আসুন ৯১ তলা বিশিষ্ট এস্পেয়ার স্টেট বিল্ডিং এর সাথে তুলনা করি। যার নীচতলা হলো একেবারে পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা। অর্থাৎ আজ থেকে সাড়ে চারশ কোটি বছর আগে। আর ৯১ তলার ওপরের ছাঁদ হলো বর্তমান সময়। বিল্ডিং- এর প্রতিটা ফ্লোর উপস্থাপন করে ৫ কোটি বছর।

সবচেয়ে পুরাতন ফসিল রেকর্ড পাওয়া যায় সাড়ে তিনশ কোটি বছর আগে। অর্থাৎ বিল্ডিং এর ২২ তলায় এসে আমরা পাই স্ট্রামেটলাইটস। আর কিছু না। স্ট্রামেটলাইটস তৈরি হয়েছিল ব্যাকটেরিয়া দিয়ে। একদম সরল এককোষী জীব। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জীবনের শুরুটা হয়েছিল সরল এককোষী জীব থেকেই। ডারউইন যেভাবে বলেছিলেন সেভাবেই।

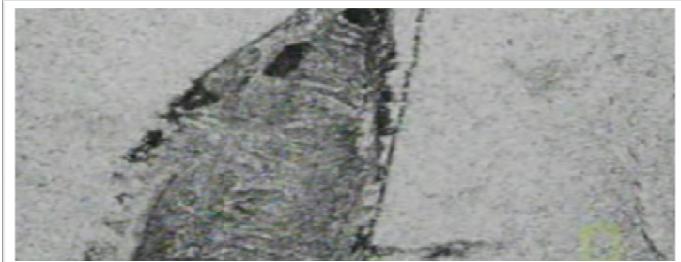
এবার আমরা ধীরে ধীরে একতলা একতলা করে উপরে উঠতে থাকি। উঠতে উঠতে ৫০ তলার আগ পর্যন্ত যত ফসিল পাওয়া গেছে সবগুলোই সরল এককোষী জীব। অর্থাৎ এই দীর্ঘ সময়ে জীবনের পরিবর্তন হয়েছে খুব সামান্য। ৫০ তলায় এসে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় দুইশ দশ কোটি বছর আগে আমরা প্রথমবারের মতো এক ধরনের প্রাণীর সন্ধান পাই যাদের কোষ নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট। বর্তমানে বেঁচে থাকা ৯৯% জীবের কোষের মতোই সেই কোষ।

৫০ তলা থেকে আমাদের যেতে হবে একদম ৮০ তলা পর্যন্ত। আজ থেকে ৬০ কোটি বছর আগে। এতলাতেই আমরা পাই প্রথম জীবজগ্তের ফসিল। যাদের বাসস্থান ছিল সমুদ্রের কর্দমাক্ত তলায়। বর্তমানে সমুদ্রের তলদেশে থাকা প্রাণীদের সাথে যাদের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে।

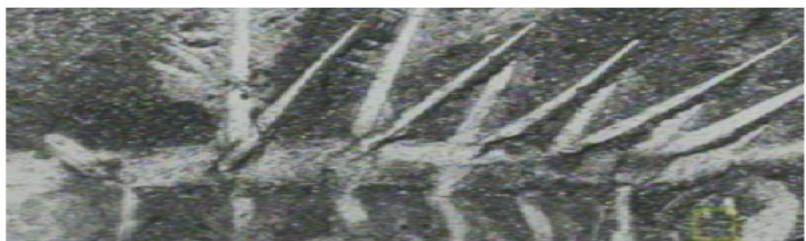


সামুদ্রিক প্রাণী

ফাইনলী দু ফ্লোরস লেটার, লাইফ হ্যাজ রিয়েলি টেকেন অফ।



প্রিক্যাম্বিয়ান যুগের প্রাণীর ফসিল



প্রিক্যাম্বিয়ান যুগের প্রাণীর ফসিল

এই প্রাণীগুলো প্রিক্যাম্বিয়ান যুগের। আজ থেকে ৫০ কোটি বছর আগে। নিচের তলাগুলোয় ফেলে আসা সরল প্রাণীদের থেকে যারা একদম আলাদা। তাদের মাথা আছে, আছে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, সময়ের সাথে সাথেই জীবনের পরিবর্তন ঘটেছে। সরল এককোষী থেকে তারা পরিবর্তিত হয়েছে, জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে।

উপরের “ট্রি অফ লাইফ” এর যে চিত্র দেওয়া আছে আসুন তার দিকে আরও ভালোভাবে তাকানো যাক।



ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ফসিল রেকর্ডগুলো সম্পূর্ণ নয়। ফাঁকা জায়গায় ভরপুর। যাকে বলা হয়ে থাকে “মিসিং লিংকস”। আর এই মিসিং লিংকগুলোই বিবর্তন তত্ত্বকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেয়।

এমন তো হতেই পারে, এই ধরনের ফসিল রেকর্ড রয়েছে। আমাদের শুধু খুঁজে পাওয়া বাকি। নাকি, ডারউইন ভুল?

বিবর্তন তত্ত্ব মতে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল সমুদ্রে। সামুদ্রিক বিভিন্ন প্রাণীই পরবর্তীতে স্তলভাগে উঠে এসে ঘাঁটি গাড়ে। সমুদ্রের সেই প্রাণীদের ফসিল রেকর্ড আমাদের হাতে আছে, হাতে আছে পরবর্তীতে স্তলে উঠে আসা প্রাণীদেরও। কিন্তু বিবর্তন তত্ত্বমতে এদের মধ্যবর্তী একধরণের প্রাণী থাকার কথা যাদের মধ্যে একই সঙ্গে সামুদ্রিক এবং স্তলভাগের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ১৮৫৮ সালে “অরিজিন অফ স্পিশিজ” প্রকাশ করার পরবর্তী দীর্ঘ সময়ে বিভানীরা এমন কোনও মধ্যবর্তী প্রাণীর ফসিল (ট্রাঞ্জিশনাল ফসিল) অথবা মিসিং লিংক খুঁজে পাননি যার মাধ্যমে ডারউইনের তত্ত্ব সঠিক প্রমাণিত হয়।

১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো এন্ড ফিল্ড মিউজিয়ামের প্রফেসর নীল স্যাভিন এবং তাঁর দলবল খুঁজে বেড়িয়েছেন মাছ থেকে চতুর্পদী প্রাণীতে বিবর্তনের মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রাণী [টিকটালিকের](#) ফসিল। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর, ২০০৪ সালে এসে তাঁরা প্রথমবারের মতো টিকটালিকের ফসিলের সন্ধান পান।



টিকটালিকের ফসিল



টিকটালিকের বাহ

ল্যাবরেটরিতে টিকটালিকের ফসিল পরীক্ষা করে দেখা যায়, টিকটালিক দেখতে অনেকটা পাখনা যুক্ত মাছের মতো, কিন্তু সামনের পাখনাগুলো আর পাখনা নেই, হয়ে গেছে কাঁধ, কনুই আর কজি নিয়ে গঠিত বাহ। মাছের মতো রয়েছে ধারালো দাঁত। কিন্তু মাছ যেমন তার ঘাড় নাড়াতে পারে না, টিকটালিকের ক্ষেত্রে দেখা গেলো সে একদম স্বাধীনভাবে তার ঘাড় নাড়াতে পারে। সুতরাং বোবা যায়, জলজ ও স্তলজ প্রাণীর মধ্যবর্তী একটি প্রাণী এই টিকটালিক।

এই গেল, একটি মিসিং লিংকের কথা। কিন্তু স্টিট তত্ত্বে বিশ্বাসী বেশিরভাগ মানুষের মতে কোনও ধরনের মিসিং লিংকই খুঁজে পাওয়া যায়নি। মিসিং লিংক একদমই খুঁজে পাওয়া যায়নি এটি যেমন ডাহা মিথ্যে কথা তেমনি অনেক বেশি আছে তাও সত্য নয়। অপ্রতুল হলেও প্রচুর মিসিং লিংক আজ অবদি আবিষ্কৃত হয়েছে, হচ্ছে। ঘোড়া, হাতী এবং উটের বিবর্তনের পুঞ্জানুপুঞ্জ ফসিল রেকর্ড পাওয়া গেছে। সরিসৃপ থেকে স্ন্যপায়ী জীবে উত্তরণের সম্পূর্ণ ধাপগুলো খুব ভালভাবে ডকুমেন্টেড (দেখুন : Evolution, Doglas J. Futuyma, pp 76)। মাছ এবং উভচর প্রাণীর মধ্যবর্তী ফসিলের উদাহরণ তো আছেই কোলাকান্ত এবং লাং ফিশ।

নরবানর (এপ) এবং মানুষের মধ্যবর্তী হারানো সূত্রের জীবাশ্মও কয়েক দশক আগে খুব ভালভাবেই পাওয়া গেছে।

Australopithecus এবং Homo - এর কয়েকটি প্রজাতিকে (যেমন, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Homo habilis, Homo erectus) তো মানব বিবর্তনের হারানো সূত্র বলা হয়ে থাকে। আমাদের জনপ্রিয় ফসিল ‘লুসি’ Australopithecus afarensis প্রজাতির অঙ্গর্গত। শ্রেণিচক্র ও উরুর হাড়ের গঠন থেকে স্পষ্ট বোৰা যায় যে, লুসি সোজা হয়ে দাঁড়তে আর দৌড়তে পারত। আর লুসির তো কেবল এই দু’ জায়গার হাড় নয়, সেই সাথে পাওয়া গেছে চোয়াল, উরু, হাত, বাহু, বক্ষপিণ্ডের সহ পুরো করোটি। পরে এ ধরনের আরো অনেক ‘লুসির’ সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৭৮ সালে তাঙ্গানিয়ার লাটেও- লি তে এবং ১৯৯৫ সালে চাদের করোটো- রোতে। এমনকি লুসির চেয়েও পুরাতন ‘বাইপেডাল মানুষের’ ফসিল পাওয়া গেছে ২০০৫ সালে। এদের সবাইকেই নরবানর আর মানুষের মধ্যবর্তী ‘হারানো যোগসূত্র’ হিসেবে ধরা হয় কারণ, এদের করোটির গঠন ছিল অনেকটা শিপ্পাঞ্জীর মত (৪০০-৫০০ ঘন সি সি), কিন্তু তাদের দাঁতের গঠন ছিল আধুনিক মানুষের মত। আর তা ছাড়া এরা যে দু’ পায়ের ওপর ভর করে খাড়া হয়ে চলতে পারত তা তো আগেই বলা হয়েছে। এছাড়া এদের শরীরের সাথে বাহুর অনুপাত মেপে দেখা গেছে (মানুষের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ৭১.৮- শিপ্পাঞ্জীর ক্ষেত্রে ৯৭.৮- আর লুসির ক্ষেত্রে ৮৪.৬) লুসির অবস্থান এ দু’ প্রজাতির মাঝামাঝি। এরা পৃথিবীতে ছিল ও থেকে ৪ মিলিয়ন বছর আগে।

ট্রাঙ্গিশনাল ফসিল নিয়ে যাঁদের আরও আগ্রহ রয়েছে তাঁরা উইকিপিডিয়ার ট্রাঙ্গিশনাল ফসিলের তালিকাটি দেখতে পারেন। তবে একটা কথা বলতেই হয়, কোনও প্রজাতির কয়টি ফসিল পাওয়া গেল এটি আজ কোনও প্রশ্ন নয়, মূল প্রশ্ন হল একটি ফসিলও কি এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে যা বিবর্তনের ধারাকে লংঘন করে? এর সোজা সাপ্টা উত্তর - না এখন পর্যন্ত একটিও তেমন ফসিল পাওয়া যায়নি। একবার বিজ্ঞানী জেবি এস হালডেনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কীভাবে বিবর্তনকে ভুল প্রমাণ করা যায়? উত্তরে হালডেন বলেছিলেন, কেউ যদি প্রিক্যাম্বিয়ান যুগে খরগোশের ফসিল খুঁজে পায়।

I will give up my belief in evolution if someone finds a fossil rabbit in the Precambrian

বলা বাহ্য্য এ ধরনের কোনও ফসিলই এ পর্যন্ত আবক্ষত হয়নি। না হওয়ারই কথা, কারণ বিজ্ঞানীরা বিবর্তনের যে ধারাটি আমাদের দিয়েছেন তা হল :

মাছ – উভচর – সরীসৃপ – স্ন্যপায়ী প্রাণী।

খরগোশ যেহেতু একটি পুরোপুরি স্ন্যপায়ী প্রাণী, সেহেতু সেটি বিবর্তিত হয়েছে অনেক পরে এবং বিভিন্ন ধাপে (মাছ থেকে উভচর, উভচর থেকে সরীসৃপ এবং সরীসৃপ থেকে শেষ পর্যন্ত খরগোশ), তাই এতে সময় লেগেছে বিস্তর। প্রিক্যাম্বিয়ান যুগে খরগোশের ফসিল পাওয়ার কথা নয়, কারণ বিবর্তন তত্ত্ব অন্যায়ী এ সময় (প্রিক্যাম্বিয়ান যুগে) থাকার কথা কতকগুলো আদিম সরল প্রাণ - যেমন নীলাভ সবুজ শৈবাল, সায়নোব্যকটেরিয়া ইত্যাদি (ফসিল রেকর্ডও তাই বলছে)। আর স্ন্যপায়ী প্রাণীর উত্তর ঘটেছে ট্রায়োসিক যুগে (প্রিক্যাম্বিয়ান যুগ শেষ হওয়ার ৩০ কোটি বছর পরে)। কাজেই কেউ সেই প্রিক্যাম্বিয়ান যুগে খরগোশের ফসিল খুঁজে পেলে তা সাথে সাথেই বিবর্তনতত্ত্বকে নস্যাং করার জন্য যথেষ্ট হত। স্টিটিবাদীদের দুর্ভাগ্য এখনও তেমন কোনও ফসিল পাওয়া যায়নি।

শুধু খরগোশ নয়, বিবর্তনের ধারাটি সকল জীবের জন্যই একইভাবে প্রযোজ্য। যেমন বিবর্তন তাত্ত্বিকদের মতে বিবর্তনের ধারায় মানুষ যেহেতু এসেছে অনেক পরে (সিনোয়োয়িক যুগের আগে নয়), তাই তার আগে, যেমন ডায়নোসারের ফসিলের সাথে একই বয়সী কোনও মানুষের ফসিল পাবার কথা নয়। খাড়া হয়ে ছাঁটা মানুষের সবচেয়ে পুরাতন ফসিল ইথিওপিয়ায় পাওয়া গেছে যা ৪০ লক্ষ বছরের পুরাতন। আর ডায়নোসারের প্রবল প্রতাপে এ পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে সেই জুরাসিক যুগে (১৪ কোটি থেকে ২০ কোটি বছর আগে)। ডায়নোসারের বিলুপ্তি ঘটে ক্রেটাসিয়াস যুগে (এখন থেকে সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে)। স্টিটিবাদীরা মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জালিয়াতি করে ডায়নোসারের আমলে ‘মানুষের ফসিল’ পাওয়ার চেষ্টা করলেও সেগুলো একটিও ধোপে টিকেনি।

সুতরাং দেখাই গেলো জীবনের বিবর্তন ঘটেছে সরল কোষ থেকে। বহু বছরে তাদের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে, গঠন জটিল হয়েছে। হয়েছে ভালো কথা। কিন্তু কীভাবে?

প্রাকৃতিক নির্বাচন

ঢাকা শহরের কথা আপাতত বাদ দেই। এখানে বাস-গাড়ি, অনেক অনেক মানুষ আর সকাল বেলা “কা- কা” করা কাক ছাড়া আর বিশেষ কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রত্যেকেই একবার হলেও গ্রামে গিয়েছেন। সেখানে নিদেনপক্ষে কোনও সুপারি বাগানে ঢুকলেও দেখা যায়, কত ধরনের পোকা- মাকড়। বাগান থেকে বের হয়ে চারপাশে তাকালে দেখা যায় নানা ধরনের পাখি, পুকুরে মাছ। ব্যাঙ, বেজি আরও কত কী। এ তো গেল গ্রামের কয়েকশ’ মিটার জায়গার কথা। সারা পৃথিবীর কথা একবার চিন্তা করে দেখুন তো। কত কোটি কোটি প্রজাতির প্রাণী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এখানে।

কীসের কারণে প্রাণের এতো বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হলো? ডারউইন বললেন, জীবনের এই বিশাল বৈচিত্র্যের কারণ প্রাকৃতিক এক শক্তি। যার নাম তিনি দিলেন “ন্যাচারাল সিলেকশন” অথবা “প্রাকৃতিক নির্বাচন”। বলা হয়ে থাকে আজ পর্যন্ত যত ধরনের আইডিয়া মানুষের মাথা থেকে এসেছে তার মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচনেরটাই সবচেয়ে শ্বাসরংতুকর। “প্রাকৃতিক নির্বাচন” বলতে ডারউইন তবে কী বুঝিয়েছেন? প্রকৃতির অন্ব একটি শক্তি কীভাবেই বা নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টির কারণ হতে পারে?

প্রকৃতি পাশবিক। এই পৃথিবীতে যে পরিমাণ প্রাণী প্রতিনিয়ত জন্মগ্রহণ করে থাকে তাদের প্রায় অর্ধেকই কোনও ধরনের বংশবৃদ্ধি করার আগেই নির্মল হয়ে যায়। শুধু প্রাণী নয়, একথা সত্য উত্তিদের ক্ষেত্রেও। ডারউইনের মতে, প্রকৃতির এই চরম পাশবিকতার কারণে দারণ সুন্দর একটি ব্যাপার ঘটে।

ধরুন একদল হরিণ। এই দলটির মধ্যে দুই একটি হরিণ আছে যারা অন্যদের থেকে সামান্য আলাদা। হতে পারে তাদের চোখ সামান্য তৌক্ষ কিংবা তারা অন্যদের থেকে ভালো দোঁড়াতে পারে। যখন একটি বাঘ তাদের আক্রমণ করবে তখন তৌক্ষ চোখওয়ালা কিংবা ভালো দৌড়বিদ হরিণগুলোর চেয়ে অর্থব হরিণগুলোরই মরে যাবার সন্তাবনা বেশি থাকবে। অর্থাৎ প্রকৃতির এই পাশবিকতা হরিণের দলটি থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরিণগুলোকে আলাদা করে দিচ্ছে। ফলে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরিণগুলোর বেশিদিন বাঁচার সন্তাবনা তৈরি হচ্ছে। আর এই কারণেই তাদের বংশবৃদ্ধির করে যাবার সন্তাবনাটাও বেশি হচ্ছে। অপরদিকে অর্থবরা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট। সময়ের সাথে সাথে যদি এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে তাহলে কয়েক কোটি বছর পর দেখা যাবে হরিণের এমন একটি প্রজাতির উত্তর হয়েছে যাদের দৃষ্টিশক্তি প্রথর, যারা ঝাড়ের বেগে দোঁড়াতে পারে। আগের হরিণের প্রজাতির সাথে যাদের কোনও ধরনের মিলই নেই।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তনের কারণেও দীর্ঘসময় পর নতুন ধরনের প্রজাতির সৃষ্টি হতে পারে- এককথায় এটিই ছিল ডারউইনের “প্রাকৃতিক নির্বাচন” তত্ত্ব? কিন্তু আসলেই কি তাই?

ডারউইনের বিরোধীতাকারীরা বলে থাকেন, না। কারণ প্রকৃতিতে জটিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রচুর প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়। যাদের দেখলেই বোঝা যায় বিবর্তনের পথ ধরে তারা এমনটা হয়নি, বরঞ্চ তাদের এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। হামিংবার্ডের পাখার এরোডাইনামিক্স, হৃদপ্লনের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া, মানুষের মস্তিষ্কে নিউরনের ফায়ারিং, মানুষের চোখের গঠন ইত্যাদি আরও বেশ কিছু প্রক্রিয়ার দিকেও তাঁরা আঙুল তুলে দেখায়।

দেখা যাক বিজ্ঞান কী বলে? বিবর্তন তত্ত্ব দিয়ে কি এমন জটিল কিছু প্রক্রিয়া আসলেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব?

চোখঃ

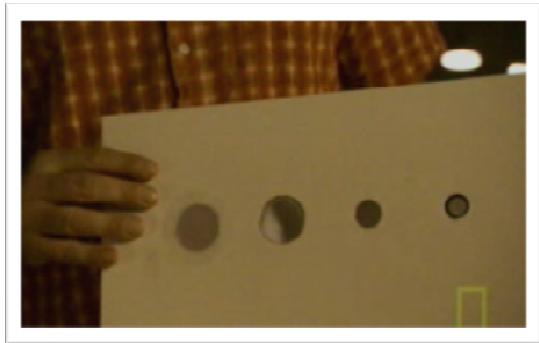
বিবর্তনতত্ত্বের সমালোচনাকারীরা সবচেয়ে বেশি আঙুল তুলেছেন মানুষের চোখের দিকে। চোখের মতো এমন নিখুঁত এবং জটিল একটি যন্ত্র কিভাবে দৈব পরিবর্তন (র্যান্ডম মিউটেশন), প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে? হোকনা শত সহস্র বছর।

একটি ক্যামেরার মতো চোখেরও আলোকরশ্মি কেন্দ্রীভূত করার জন্য লেপ্স, আলোকরশ্মির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইরিস, আর এই আলোকরশ্মি থেকে ছবি আবিষ্কার করার জন্য একটি ফোটোরিসেপ্টর প্রয়োজন। এই তিনটি যন্ত্রাংশ একসাথে কাজ করলেই কেবলমাত্র চোখ দিয়ে কিছু দেখা সম্ভব হবে। যেহেতু বিবর্তন তত্ত্বতে, বিবর্তন প্রক্রিয়া চলে তারে- তাহলে লেপ্স, রেটিনা, চোখের মধ্যে সবকয়টি একসাথে একই ধরনের উৎকর্ষ সাধন করলো কীভাবে? বিবর্তন সমালোচনাকারীদের প্রশ্ন এটাই।

সুইডেনের লুন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড্যান এরিক নিলসন গবেষণার মাধ্যমে বের করে দেখান যে, কীভাবে কোনও প্রাণীর শরীরের উপর আলোক সংবেদনশীল ছোট এবং রঙিন স্থান পরবর্তীতে মানুষের চোখের মতো জটিল যন্ত্র পরিবর্তিত হতে পারে।

ক্যাম্বরিয়ান যুগে শরীরের উপর আলোক সংবেদনশীল ছোট একটি স্থানবিশিষ্ট প্রাণীরা আলোর দিক পরিমাপের মাধ্যমে ঘাতক প্রাণীদের হাত থেকে বেঁচে যাবার অতি সামান্য সুযোগ পেত। সময়ের সাথে সাথে এই রঙিন সমতল স্থানটি ভেতরের দিকে ঢেবে গিয়েছে, ফলে তাদের দেখার ক্ষমতা সামান্য বেড়েছে। গভীরতা বাড়ার পাশাপাশি পরবর্তীতে আলো ঢোকার স্থান সরু হয়েছে। অর্থাৎ দেখার ক্ষমতা আরও পরিষ্কার হয়েছে।

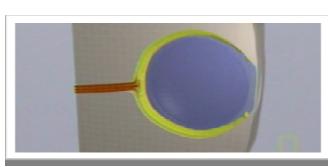
নীচের ছবি দুটি লক্ষ্য করুন। একটি অন্ধকার রূম। পেছনে একটি বাতি জ্বলছে। সবচেয়ে বামে একটি সমতল কাগজ লাগানো। যার



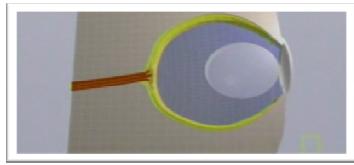
মাধ্যমে আমরা শুধু বুঝতে পারছি আলো আছে। কিন্তু কোথা থেকে আলো বের হচ্ছে কিংবা বাতিটি কোথায় তেমন কিছুই জানা যাচ্ছে না। তারপরের পিংপং বলটিতে আলো প্রবেশের স্থানটি চওড়া আর গভীরতা কম। তারপরেরটায় স্থানটি আগেরটার চেয়ে সংকুচিত এবং গভীরতা বেশি। সর্ব ডানেরটায় আলো প্রবেশের স্থান সবচেয়ে সংকুচিত এবং গভীরতা সবচেয়ে বেশি। আর এটি দিয়েই আমরা সবচেয়ে ভালোভাবে আলোটির উৎস বুঝতে পারছি।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি পরিবর্তনই প্রাণীকে কিঞ্চিৎ হলেও সুবিধা প্রদান করেছে। সময়ের সাথে সাথে শুরুর এই আলোক সংবেদনশীল স্থান রেটিনায় পরিণত হয়েছে, সামনে একটি লেপ্সের সৃষ্টি হয়েছে।

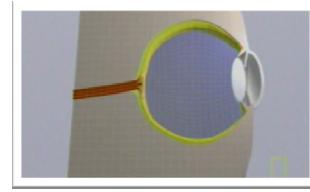
ধারনা করা হয়, প্রাকৃতিক ভাবে লেপ্সের সৃষ্টি হয়েছে যখন চোখকে পূর্ণকরে রাখা স্বচ্ছ তরলের সময়ের সাথে সাথে ঘনত্ব বেড়েছে। ছবিতে দেখুন সাদা অংশটি তৈরি হচ্ছে চোখকে পূর্ণ করে রাখা স্বচ্ছ তরলের মাধ্যমে। তরলের ঘনত্ব যত বেড়েছে লেপ্সের গঠন ততো ভালো হয়েছে, দৃষ্টিশক্তি প্রথর হয়েছে।



ক) সচেতন তরলে পরিপূর্ণ



খ) তরল ঘন হচ্ছে

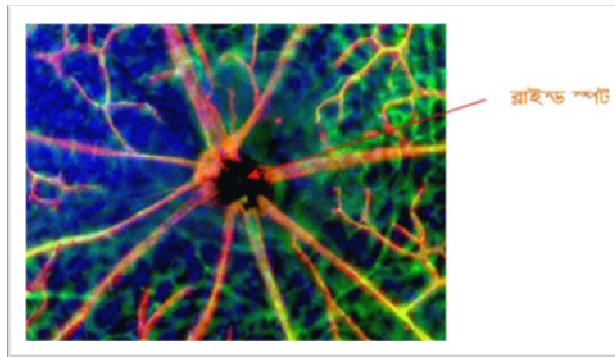


গ) ঘন হতে হতে লেপের সৃষ্টি

বলে রাখা প্রয়োজন বিজ্ঞানীদের তৈরি করা চোখের বিবর্তনের প্রতিটি শর বর্তমানে জীবিত প্রাণীদের মধ্যেই লক্ষ করা যায়। এছাড়াও শুধুমাত্র আলোক সংবেদনশীল স্থান বিশিষ্ট প্রাণী ছিল আজ থেকে ৫৫ কোটি বছর আগে। বিজ্ঞানীরা গণনা করে বের করেছেন, এই আলোক সংবেদনশীল স্থানটি মানুষের চোখের মতো হবার জন্য সময় প্রয়োজন মাত্র ৩৬৪ হাজার বছর।

এবার আসা যাক মানুষের চোখ সংক্রান্ত আলোচনায়। আমাদের চোখ কি আসলেই নিখুঁত?

না। যেহেতু বিবর্তন বা প্রাকৃতিক নির্বাচন শুধুমাত্র বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর ভিত্তি করে দীর্ঘ সময় ধরে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হয়, তাই খুব যুক্তিসংগত কারণেই প্রাণীদেহে অনেক ক্রিটিপূর্ণ অঙ্গপ্রতঙ্গ দেখা যায়। মানুষের চোখও তার ব্যতিক্রম নয়। মানুষের চোখের অক্ষিপটের ভেতরে একধরনের আলোগ্রাহী কোষ আছে যারা বাইরের আলো গ্রহণ করে এবং তারপর একগুচ্ছ অপটিক নার্ভের (আলো গ্রাহী জাল) মাধ্যমে তাকে মস্তিষ্কে পৌঁছোনোর ব্যবস্থা করে, যার ফলে আমরা দেখতে পাই। মানুষের চোখ যদি ‘সর্বাঙ্গ সুন্দর ও নিখুঁত নকশাসম্পন্ন’ (perfect design) হত তা হলে নিচ্যাই জালের মত করে ছড়িয়ে থাকা এই স্নায়গুলো আলোগ্রাহী কোষগুলোর সামনের দিকে বসানো থাকত না! কারণ এ ধরনের নকশায় অপটিক নার্ভের জালিতে বাধা পেয়ে আলোর একটা বড় অংশ ফিরে যায় ফলে আমাদের যতখানি দেখতে পাবার কথা আমরা তার থেকে কম দেখতে পাই। অক্ষিপটের ঠিক সামনে এই স্নায়গুলো জালের মত ছড়ানো থাকে, সাথে সাথে এই স্নায়গুলোকে যে রক্তনালীগুলো রক্ত সরবরাহ করে তারাও আমাদের অক্ষিপটের সামনেই বিস্তৃত থাকে। এর ফলে আলো বাধা পায় এবং আমাদের দৃষ্টিশক্তি কিছুটা হলেও কমে যায়। স্নায়গুলোর এই অসুবিধাজনক অবস্থানের কারণে আমাদের চোখে আরেকটি বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্নায়বিক জালটি মস্তিষ্কে পৌঁছোনোর জন্য অক্ষিপটকে ফুটো করে তার ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়েছে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে একটি অঙ্গবিন্দুর (blind spot)।



কুকুর, বিড়াল কিংবা ঈগলের দৃষ্টিশক্তি যে মানুষের চোখের চেয়ে বেশি তা সবাই জানে। মানুষ তো বলতে গেলে রাতকানা, কিন্তু অনেক প্রাণীই আছে রাতে খুব ভাল দেখতে পায়। আবার অনেক প্রাণীই আছে যাদের চোখে কোনও অঙ্গবিন্দু নেই। যেমন, স্কুইড বা অটোপাস। এদের মানুষের মতই একধরনের লেন্স এবং অক্ষিপটসহ চোখ থাকলেও অপটিক নার্ভগুলো অক্ষিপটের পেছনে অবস্থান করে এবং তার ফলে তাদের চোখে কোনও অঙ্গবিন্দুর সৃষ্টি হয়নি। বিবর্তন তত্ত্বের মাধ্যমে আমাদের চোখের এই সীমাবদ্ধতা বা ক্রিটিকে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়।

বিবর্তন কাজ করে শুধুমাত্র ইতোমধ্যে তৈরি বা বিদ্যমান গঠনকে পরিবর্তন করার মাধ্যমে, সে নতুন করে কিছু স্থিতি বা বদল করতে পারে না। মানুষের মত মেরুদণ্ড প্রাণীর চোখ স্থিতি হয়েছে মস্তিষ্কের বাইরের দিকের অংশকে পরিবর্তন করে যা অনেক আগেই স্থিতি হয়েছিলো, বহুকাল ধরে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের এই সংবেদনশীল কোষগুলো অক্ষিপটের আকার ধারণ করলেও মস্তিষ্কের পুরোনো মূল গঠনটি তো আর বদলে যেতে পারেনি, তার ফলে এই জালের মত ছড়িয়ে থাকা মাঝুগুলোও তাদের আগের অবস্থানেই রয়ে গেছে। কিন্তু অন্যদিকে স্কুইড জাতীয় প্রাণীর চোখ বিবর্তিত হয়েছে তাদের চামড়ার অংশ থেকে, মস্তিষ্কের অংশ থেকে নয়। এক্ষেত্রে তৃকের মাঝুগুলো মস্তিষ্কের মত ঠিক বাইরের স্তরে না থেকে ভেতরের স্তরে সাজানো থাকে, আর এ কারণেই মাঝুগুলো চোখের অক্ষিপটের সামনে নয় বরং পেছনেই রয়ে গেছে। আমাদের চোখ যদি এভাবে লাখ লাখ বছর ধরে প্রাকৃতিভাবে বিবর্তিত না হয়ে কোনও পূর্বপরিকল্পিত ডিজাইন থেকে তৈরি হত তাহলে হয়তো চোখের এত সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মাথা ঘামাতে হত না।

এ তো গেলো শুধু চোখের কথা। হৃদপ্তন্তের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে, নিউরন ফায়ারিং সবকিছুই পুঁখানুপুঁখভাবে বিবর্তন দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

“সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট” অর্থাৎ ডারউইনের ভাষ্যমতে যদি জীবন সংগ্রাম প্রকৃতিতে না থাকতো তাহলে কী অবস্থা হতো একবার ভেবে দেখেছেন?

হাতী অন্য সব প্রাণীর তুলনায় সবচেয়ে কম বংশবৃদ্ধি করেও তার ৯০-১০০ বছরের জীবনে প্রায় ৬ টি বাচ্চার জন্ম দিতে পারে। অর্থাৎ যদি সবগুলো বাচ্চা বেঁচে থাকে তাহলে এক জোড়া হাতী থেকে ৭০০-৭৫০ বছরে প্রায় ১৯০ লক্ষ হাতীর জন্ম হবে। প্রকৃতিতে থায় সব জীবই এরকম বাড়ি শিশুর জন্ম দিয়ে থাকে, একটা ব্যাকটেরিয়া প্রতি ২০ মিনিটে বিভক্ত হয়ে দুটো ব্যাকটেরিয়ায় পরিণত হয়, হিসেব করে দেখা গেছে যে এরা সবাই বেঁচে থাকলে এক বছরে তারা বৎস বৃদ্ধি করে সারা প্রথিবী আড়াই ফুট উঁচু করে দেকে দিতে পারতো। কড় মাছ বছরে প্রায় ২০ থেকে ৫০ লাখ ডিম পাড়ে, একটি মেপল বা আম বা জাম গাছে হাজার হাজার ফুল এবং ফল ধরে। এইসব কিছুই যদি জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতো তাহলে আজকে প্রথিবীতে থাকার আর কোনও জায়গায় থাকতো না। ভাণিস কড় মাছের ডিমের ৯৯% ই প্রথম মাসেই কোনও না কোনও ভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, বাকি যা বেঁচে থাকে তার প্রায় ৯০% জীবনের প্রথম বছরেই কোনও না কোনওভাবে মৃত্যুবরণ করে। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই তাই। প্রতিটি জীবের মধ্যে প্রাকৃতি তুলনামূলকভাবে বেশি উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদেরই টিকিয়ে রাখে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ডারউইনের শেষ দাবিটা ও সঠিক। অর্থাৎ প্রাণীজগৎ সরল কোষ থেকে বিবর্তিত হয়ে জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। প্রজাতি থেকে প্রজাতিতে আলাদা হয়েছে। আর পেছনে কারণ হিসেবে কাজ করেছে, প্রকৃতির এক অঙ্গ শক্তি- “প্রাকৃতিক নির্বাচন”।

তথ্য সূত্রঃ

শিরোনামটি গ্রহণ করা হয়েছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফীর নভেম্বর ২০০৪ এর কভার স্টোরি থেকে।
১। Was Darwin Wrong- ন্যাশনাল জিওগ্রাফী, নভেম্বর ২০০৪ সংখ্যা।

২। এক বিবর্তনবিরোধী প্রত্যুভাবে - অভিজিৎ রায় [[http://mukto-mona.com/banga_blog/?p=936]]

৩। বিবর্তনের পথ ধরে- বন্যা আহমেদ। [[<http://www.mukto-mona.com/Articles/bonna/book/index.htm>]]

৪। The Science of Evolution and the Myth of Creationism: Knowing What's Real and Why It Matters, Ardea Skybreak, Insight Press; illustrated edition edition, 2006

৫। নদিত নকশা - নাকি অজ্ঞানতা ? – অভিজিৎ রায় [[<http://www.sachalayatan.com/avijit/9423>]]

ওয়াজ ডারউইন রং?
